

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষা

মোঃ নাবিল তাহমিদ

মাদকদ্রব্য আজ কেবল একটি ব্যক্তিগত অপরাধ বা বিচ্ছিন্ন সামাজিক সমস্যা নয় বরং এটি একটি দেশের জন্য গভীর রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক সংকট। উন্নয়ন, মানবসম্পদ ও সামাজিক স্থিতিশীলতার পথে মাদক একটি নীরব ঘাতক হিসেবে কাজ করছে। ভৌগোলিক অবস্থান, সীমান্ত দুর্বলতা, বেকারত্ব ও মূল্যবোধের অবক্ষয় বাংলাদেশকে মাদক ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। দেশে বর্তমানে প্রায় ৮২ লাখ মানুষ কোনো না কোনো ধরনের অবৈধ মাদক ব্যবহার করছে। এই বাস্তবতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ শুধু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব নয় বরং এটি রাষ্ট্র, সমাজ ও নাগরিকসহ সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব।

মাদক বলতে এমন সব নেশাজাতীয় ও মনোপ্রভাবকারী উপাদানকে বোঝায়, যা মানবদেহ ও মনকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণহীন করে তোলে। একবার মাদকে আসক্তি তৈরি হলে ব্যক্তি তার নিজের বিবেক কাজে লাগিয়ে কোনো কাজ করতে পারে না। ব্যক্তির স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়। নিজের ও পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যতকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। মাদকদ্রব্য শরীরের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তি কমিয়ে দেয়। মাদক হৃদযন্ত্র ও রক্তচাপে সমস্যা সৃষ্টি করে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়, ফুসফুস, যকৃত ও কিডনি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করলে এইডস ও হেপাটাইটিসের মতো সংক্রামক রোগের আশঙ্কা বাড়ে। এছাড়া অতিরিক্ত মাদক সেবনে হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে। দিনশেষে একজন মাদকসেবী সবকিছু হারিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে পড়েন। মাদক তাই শুধু সাময়িক নেশা নয় বরং এটি মানুষের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক পতনের এক ভয়াবহ প্রক্রিয়া।

২০২৫ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (বিএমইউ) এবং রিসার্চ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস লিমিটেড (আরএমসিএল) যৌথভাবে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। বাংলাদেশে মাদক অপব্যবহারকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা, ধরণ ও সংশ্লিষ্ট কারণসমূহ নিয়ে পরিচালিত জাতীয় পর্যায়ের ওই গবেষণার ফল সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়। গবেষণায় বলা হয়, দেশে বর্তমানে প্রায় ৮২ লাখ মানুষ অবৈধ মাদক ব্যবহার করছে, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে গাঁজা (ক্যানাবিস) সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মাদক। প্রায় ৬০ লাখ মানুষ গাঁজা ব্যবহার করে। এরপর রয়েছে ইয়াবা বা মেথামফেটামিন, যা ব্যবহার করে প্রায় ২২ লাখ মানুষ। অ্যালকোহল (অ্যালকোহল) ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। এছাড়া কোডিন ফসফেটযুক্ত কফ সিরাপ, হেরোইন, ঘুমের ওষুধ ও ইনহেল্যান্ট ব্যবহারের হারও উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৩৯ হাজার মানুষ ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করে। এদের এইচআইভি ও হেপাটাইটিসসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি।

বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য, ইনজেকশন ও ওষুধ সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ইয়াবা ও ফেনসিডিল সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করে দ্রুত শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করছে। শহরাঞ্চলের ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী থেকে উচ্চবিত্তদের মাঝেও মাদক গ্রহণের হার বাড়ছে। এমনকি অনেক পথশিশুও এই মাদকের করাল গ্রাস থেকে রেহাই পাচ্ছে না। যা আমাদের সমাজের জন্য এক অশনি সংকেত। গ্রামাঞ্চলে মাদকদ্রব্যের প্রধান ভোক্তা হচ্ছে আমাদের যুবসমাজ। যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এতে করে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। মাদকের ভয়াল থাবা থেকে শহর ও গ্রামীণ যুবসমাজকে রক্ষা করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

মাদকের প্রথম শিকার হয় ব্যক্তি নিজেই। নিয়মিত মাদক গ্রহণে তার শরীর ভেঙে পড়ে, মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং কর্মক্ষমতা কমে যায়। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে পড়াশোনা থেকে, কর্মজীবী মানুষ হারায় দায়িত্ববোধ। হতাশা, সহিংসতা ও আত্মবিধ্বংসী আচরণ মাদকাসক্তির সাধারণ পরিণতি। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি নিজেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বোঝায় পরিণত করে। সাধারণত বন্ধু বা অসং সঙ্গের মাধ্যমে যুবকরা মাদকের সাথে পরিচিত হয়। শিক্ষার্থী বা বেকার ব্যক্তি মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে তারা মাদকের অর্থ যোগান দিতে পরিবার ও সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। মাদকাসক্ত একজন সদস্য পুরো পরিবারের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয় ডেকে আনে। পরিবারের আয় ব্যয় হয় মাদকের পেছনে, নষ্ট হয় পারিবারিক বন্ধন। কলহ, নির্যাতন ও মানসিক চাপ পরিবারকে ভেঙে দেয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু ও কিশোররা, যারা এই পরিবেশে বেড়ে উঠে ভবিষ্যতে নিজেরাও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। পরিবার যখন দুর্বল হয়, সমাজও তখন দুর্বল হয়ে পড়ে।

মাদক অপরাধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, খুনসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধের পেছনে মাদক একটি বড়ো ভূমিকা পালন করে। মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শক্তিশালী অপরাধচক্র, যা সমাজের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করে। সামাজিক মূল্যবোধ ভেঙে পড়ে এবং সাধারণ মানুষ আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়। পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায় যে মাদকের টাকা না দেয়ায় সন্তান বাবা-মাকে মারধর কিংবা হত্যার মতো অপরাধ করছে। মাদকের প্রভাবে স্বামী, স্ত্রীকে নির্যাতন করছে। পুরুষ তার স্ত্রী- সন্তানের উপর অকারণে নির্যাতন ও নিপীড়ন করছে। এছাড়াও এলাকায় প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে মাদক বিক্রেতার মধ্যেও মারামারি ও হানাহানির ঘটনা ঘটেছে প্রতিনিয়ত। মাদকের কারণে প্রভৃতি সামাজিক বিশৃঙ্খলা প্রকট আকার ধারণ করছে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে মাদক মানবসম্পদের ওপর সরাসরি আঘাত হানে। কর্মক্ষম যুবসমাজ মাদকাসক্ত হলে উৎপাদনশীলতা কমে যায়। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার হ্রাস পায়। এতে করে দেশের কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা বিস্তারের লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগের বাইরে আরও সাতটি বিভাগে ২০০ শয্যা করে সাতটি মাদকাসক্ত নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প বর্তমান সরকার অনুমোদন দিয়েছে। যা সম্যোপযোগী সিদ্ধান্ত। তবে মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। যা উন্নয়ন খাতে ব্যয় হলে দেশ আরও এগিয়ে যেতে পারত। বিনিয়োগ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আইনের শাসন দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে। দেশে অবৈধ মাদকের প্রবাহ রোধ, ঔষধ ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার্য বৈধ মাদকের শুল্ক আদায় সাপেক্ষে আমদানি, পরিবহণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে কাজ করে এই অধিদপ্তর। এছাড়াও জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিবিড় কর্ম-সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

বাংলাদেশে ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮’ কে সংশোধন করে ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি শক্তিশালী আইন। এতে মাদক উৎপাদন, পরিবহন ও বিক্রির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। পাশাপাশি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কথাও বলা হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো আইন থাকা সত্ত্বেও মাদক সরবরাহকারীরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উপায়ে চোরাচালান ও সরবরাহ করার কাজ করে যাচ্ছে। আইনের কার্যকর ও নিরপেক্ষ বাস্তবায়ন এখনও বড়ো চ্যালেঞ্জ।

সরকার মাদকবিরোধী অভিযানে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা, সীমান্ত নজরদারি বৃদ্ধি, বিশেষ অভিযান ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মাদক নির্মূলে পরিবার থেকেই প্রতিরোধ শুরু করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেমন- পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও কোস্টগার্ড মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ নিয়মিত মাদক অভিযান পরিচালনা করা, অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও মাদকদ্রব্য জব্দ কার্যক্রমে ব্যাপক সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

মাদক কখনও শুধু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নির্মূল করা সম্ভব নয়। মাদক নির্মূলে জনসচেতনতার বিকল্প নেই। পরিবারে নজরদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা, গণমাধ্যমে দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। যুবসমাজকে খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত করতে পারলে মাদকের চাহিদা কমবে। মাদকাসক্তদের কেবল অপরাধী হিসেবে দেখলে সমস্যার সমাধান হবে না। তাদের একটি বড়ো অংশ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে। মানসম্মত পুনর্বাসন কেন্দ্র, কাউন্সেলিং ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে পুনরায় মাদকে ফেরার ঝুঁকি কমবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কোনো একক প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়। এটি একটি জাতীয় দায়িত্ব। আইন প্রয়োগ, সচেতনতা, নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিরোধের সমন্বয়েই কেবল মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। আজ যদি আমরা দৃঢ় অবস্থান না নেই, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। এখনই সময় রাষ্ট্র, সমাজ ও নাগরিক সবাই মিলে মাদকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। এর মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর

পিআইডি ফিচার